D

রায় গুণাকর - ভারতচন্দ্র - অন্নদামঙ্গল কাব্য থেকে প্রাপ্ত পরিচয়,

প্রথমেই বলে নেওয়া উচিত, মধ্যযুগের শেষ উল্লেখযোগ্য কবি ভারতচন্দ্র কিন্তু অন্নদামঙ্গল কাব্যে কোথাও স্পষ্ট করে নিজের আত্মপরিচয় দেননি, এ বিষয়ে কবিকঙ্কনের সঙ্গে তাঁর সুস্পষ্ট পার্থক্য বর্তমান, তবে তাঁর প্রথম রচনা 'সত্যপীরের পাঁচালী'তে তাঁর নিজের সম্পর্কে তিনি বলেছেন — "ভরদ্বাজ অবতংস, ভূপতি রায়ের বংশে, সদা, ভাবে হতকংস, ভুরসুটে বসতি।

নরেন্দ্র রায়ের সুত, ভারত ভারতী যুত, ফুলের মুখটি খ্যাত, দ্বিজপদে সুমতি॥

এই বর্ণনা অনুযায়ী কবির জন্মস্থান 'ভুরসুট', ভূপতি রায়ের বংশোদ্ভূত নরেন্দ্র রায়ের পুত্র তিনি।

অন্নদামঙ্গল কাব্যে কবি বলছেন —

"ভুরসুট পরগনায় নৃপতি নরেন্দ্র রায়
মুখটি বিখ্যাত দেশে দেশে,
ভারত তনয় তার অন্নদামঙ্গল যার
কহে কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে॥

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এই জীবনবাদী কবি, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র তাঁর সমকালে দেবনির্ভরতাকে বর্জন করে ব্যক্তিসচেতনতা ও মানবিকতা-র সূচনা করেছিলেন, কিন্তু তা হলেও ঈশ্বর গুপ্তের আগে তাঁর জীবন কথা নিয়ে কেউই খুব একটা আগ্রহী হননি,

২)

ঈশ্বর গুপ্তের বর্ণনা অনুযায়ী "ইনি ১৬৩৪ শকে বাংলা—১১১৯ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৬৮২ শকে বাংলা ১১৬৭ সালে ইহলোক হইতে অবসৃত হয়েন।" যদিও পরবর্তী কালে প্রাপ্ত ও আলোচিত তথ্য অনুযায়ী ভারতচন্দ্রের জন্ম ১৭১২ সালে এবং ১৭৬০ তে তাঁর মৃত্যু হয়।

ভারতচন্দ্রের জন্মস্থান হিসেবে উল্লিখিত 'ভুরসুট' বা ভূরিশ্রেষ্ঠ ছিল দামোদর নদের তীরবর্তী একটি সমৃদ্ধ জনপদ, দক্ষিণ রাঢ়ের রাজধানী ও প্রসিদ্ধ বন্দর। 'ভূরি'— শব্দটি সম্ভবত 'বহু' অর্থে ব্যবহৃত, এবং 'শ্রেষ্ঠ' → শ্রেষ্ঠী— অর্থাৎ 'বণিক'দের বোঝানো হয়েছে, "অনেক বণিকের বসবাস"-অর্থেই 'ভূরিশ্রেষ্ঠ' নামটি ব্যবহৃত হোত। সেকালে হাওড়া ও হুগলী জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে তৈরী হয়েছিল ভূরিশ্রেষ্ঠ বা ভুরসুট পরগনা, বর্তমান হাওড়া জেলার অন্তর্গত পেঁড়ো বা পান্ডুয়া গ্রামটিই ভারতচন্দ্রের জন্মভূমি, ভুরসুটের দ্বিতীয় গড় ছিল এই পান্ডুয়া বা পেঁড়ো গ্রামে, এখানেই রাজা কৃষ্ণ রায়ের ভ্রাতা শ্রীমন্ত রায়ের শাখায় ভারতচন্দ্রের জন্ম।

রাজা কৃষ্ণ (শ্রীমন্ত রায়)
|
মহেন্দ্র রায়
|
গোপী
|
ভূপতি
|
সদাশিব
|
নরেন্দ্র ← চতুর্ভুজ অর্জুন দয়ারাম ভারতচন্দ্র।

কবির পিতা নরেন্দ্র নারায়ন একজন প্রতাপ শালী জমিদার ছিলেন, কিন্তু বর্ধমান রাজের সঙ্গে বিবাদের কারণে নরেন্দ্র নারায়ন কে সর্বস্বান্ত হতে হয়, এই পরিস্থিতিতে ভারত চন্দ্র কে পাঠিয়ে দেওয়া হয় 'নওয়াপাড়া' গ্রামে, তাঁর মাতুলালয়ে, এখানে ভারতচন্দ্র চোদ্দ বৎসর অতিবাহিত করেন, 'সংক্ষিপ্ত সার ব্যাকরণ' ও 'অভিধান' পাঠ করার পর একটি গ্রাম্য বালিকা কে বিবাহ করে স্বগৃহে ফিরে আসেন, এর পরবর্তী জীবন কথা যেমন ঘটনা বহুল তেমনি রোমাঞ্চকর, দেবানন্দপুরে কায়স্থ কুলতিলক রামচন্দ্র দত্ত রায় মুনশীর গৃহে বসবাস কালীন ফারসী ভাষায় শিক্ষা লাভ করেন এবং রচনা করেন তাঁর প্রথম গ্রন্থ — "সত্যপীরের পাঁচালী,", এর পর একাদিক্রমে জমির মোক্তারী করা, সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়া, আবার গৃহস্থাশ্রমে ফিরে আসা; ইত্যাদি নানা ঘটনা পেরিয়ে তিনি চলে আসেন ফরাস ডাঙ্গায়, ফরাসী গভর্নমেন্টের তৎকালীন ভারতীয় ব্যবসা সংক্রান্ত বিভাগের দেওয়ান ইন্দ্র নারায়ন চৌধুরীর সহায়তায় তিনি ওলন্দাজ দের দপ্তরে চাকুরী পান, পরে ইন্দ্রনারায়ন চৌধুরীর মাধ্যমেই তাঁর সঙ্গে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে সভাকবি পদে নিযুক্ত করেন, এবং তাঁকে 'রায় গুণাকর' উপাধি প্রদান করেন, এখানেই রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথমে তিনি 'রস মঞ্জরী' নামে কাব্য-তত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ ও পরে 'অন্নদা মঙ্গল' কাব্য রচনা করেন।

তাঁর নিজের ভাষায় –

"সভাসদ তোমার ভারতচন্দ্র রায়।
মহাকবি মহাভক্ত আমার দয়ায়॥
তুমি তারে রায়গুণাকর নাম দিও,
রচিতে আমার গীত সাদরে কহিও॥"

অর্থাৎ এখানে কবি স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ ছিলেন, এবং রাজা তাঁকে 'রায়গুণাকর' উপাধি দিয়েছিলেন। অনিবার্য ভাবে লক্ষ্য করা যায় যে প্রত্যেকটি কবিতার শেষে ভণিতা অংশে ভারতচন্দ্র তাঁর নিজের সম্বন্ধে কিছু কিছু পরিচয় দিয়েছেন. যেমন একজায়গায় কবি বলছেন – "ভারত যাচয়ে বর, অন্নপূর্ণার দয়া কর
পরীক্ষিত, তনু, ভগবানে,"

এই উক্তিটির মাধ্যমে ভারতচন্দ্র তাঁর তিন পুত্র পরীক্ষিত, রামতনু ও ভগবানের কথা বলেছেন। মধ্যযুগের এই নাগরিক কবির পত্নীর নাম ছিল মল্লিকা, মাত্র ৪৮ বছর বয়সে ১৬৮২ শকাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

— · —